সাবা মাহমুদ
নারীবাদ ও ইসলাম

ফাহমিদ-উর-রহমান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

আরজ

পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়ার জগতে সাবা মাহমুদ এক মশহুর নাম। জীবদ্দশায় তিনি তার কাজকর্ম ও গবেষণাকর্ম দিয়ে পশ্চিমের নারীবাদবিষয়ক ভাবনাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন। পশ্চিমা নারীবাদ যে শুধু নারীবাদ নয়, এটা যে একই সাথে একটা সাম্রাজ্যবাদী প্রজেক্ট, এটা যে ভিন্ন সংস্কৃতিকে অপর বানিয়ে দাবিয়ে রাখতে চায় এবং ভিন্ন সংস্কৃতির প্রগতিশীল উপাদানকে অস্বীকার করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে চায়—এ আলাপগুলো সাবা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অ্যাকাডেমিয়ার জগতে তুলতে পেরেছেন। সাবা ইন্তেকাল করেছেন, কিন্তু তার চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা এখনও অটুট আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে সেকুলারিজম, নারীবাদ বিষয়ে যারা সাধারণত সরব থাকেন, তারা প্রধানত কলকাতা ও পশ্চিমাকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার পুনরাবৃত্তি করেন। এর মধ্যে কোনো মৌলিকতা নেই। সাবার চিন্তাভাবনা বাংলাদেশের এইসব উপনিবেশিত চিন্তার জমিনে নতুন আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাতে পারে। বিশেষ করে যেই কালে সেকুলারিজম, নারীবাদ প্রভৃতি ইসলামকে প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে এক মতাদর্শিক ও আগ্রাসী লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে, সে সময় সাবা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবেন বলেই আমার বিশ্বাস। এ লেখার ভেতর দিয়ে আমি শুধু নারীবাদকে বোঝার চেষ্টা করিনি, আমি সাবার চোখ দিয়ে বাংলাদেশকেও বোঝার চেষ্টা করেছি। যারা বাংলাদেশের রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে ভাবেন, তাদের জন্য এ বই কিছুটা হলেও কাজে লাগতে পারে।

বরাবরের মতো গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স-এর সম্পাদক ফয়সাল আহমদকে মুবারকবাদ। তার জোরাজুরিতে এ লেখাটা অবশেষে প্রকাশ পেল।

ফাহমিদ-উর-রহমান

এক

সাবা মাহমুদ পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়াতে নৃতাত্ত্বিক হিসেবে মশহুর হয়েছেন তার বিশিষ্ট চিন্তাভাবনার জন্য। তিনি কোনো গতানুগতিক চিন্তার পুনরুৎপাদন করেননি। উলটো পশ্চিমের প্রথাগত চিন্তার ভিতকে তিনি প্রশ্ন করেছেন এবং মোকাবিলা করেছেন। বিশেষ করে পশ্চিমা নারীবাদের ছদ্মবেশী 'মুক্তিদাতার' চেহারাকে তিনি উন্মোচন করেছেন এবং পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়ায় ইসলাম নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির মাত্রাকে শনাক্ত করেছেন। সাবা তার চিন্তাচর্চার জায়গায় ভয়ানক সততার পরিচয় দিয়েছেন এবং উদারনৈতিকদের পছন্দমতো ইসলাম ও পশ্চিমের ভেতরে কোনো বিভাজন রেখা টানতে চাননি। তার জ্ঞানতাত্ত্বিক সফরনামায় যুক্ত হয়েছে নানা রকমের জিনিসপত্র : ইসলাম, সেকুলারিজম, রাজনৈতিক তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সেমিওটিক্স, নারীবাদ, যৌনতা ও দর্শন।

৯/১১-এর ঘটনার পর পশ্চিমের নীতিনির্ধারকরা আমরা ও ওরা—এই দুই ভাগে পৃথিবীকে ভাগ করে ফেলে এবং মুসলিম জগতের ওপর রীতিমতো লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেয়। ৯/১১-পরবর্তী সময়ে পশ্চিমা মিডিয়া ও প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামের ব্যাপারে হয়ে ওঠে পুরোপুরি অসহিষ্ণু। স্যামুয়েল হান্টিংটনের সভ্যতার দ্বন্দ্বতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে শুরু হয় মুসলিম জগতের ওপর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের মহড়া। একই সাথে মুসলিম জগতের বিরুদ্ধে শুরু হয় আদর্শিক যুদ্ধ। 'অত্যাচারিত' মুসলিম নারীর ছবি এই আদর্শিক যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ভালোমতো ব্যবহৃত হয়। উদারনৈতিক নারীবাদীদের সংজ্ঞায়িত নারীর অধিকার ধারণাকে ব্যবহার করে ইসলামের ভেতরে চরমপন্থি, মধ্যপন্থি ও উদার হিসেবে ক্যাটাগরি তৈরি করা হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত মানবাধিকারের যে কাঠামো তৈরি হয়, তা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনিদের নিষ্ঠুর অভিযানের বৈধতা উৎপাদন করা হয়। মানবাধিকার রক্ষার এই বয়ানের সামনে মুসলিম নারীকে দেখানো হয় প্রাতিষ্ঠানিক পিতৃতান্ত্রিকতার নির্মম শিকার হিসেবে, যা কিনা একটি ধর্ম ও সংস্কৃতির নির্দেশক। অত্যাচারিত মুসলিম নারীকে রক্ষা করার জন্য পশ্চিমাদের মানবিক হস্তক্ষেপের প্রতি আকুলতা ৯/১১ এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরও বেশি স্ফীত হয়। সাবা মাহমুদ দৃঢ়ভাবে এই ক্যাটাগরির রাজনীতি ও উদারনৈতিক নারীবাদী ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়ান। তিনি ৯/১১-উত্তর ভালো ও খারাপ মুসলিম বানানোর যে সাংস্কৃতিক রাজনীতি, তাতে শরিক হতে অস্বীকার করেন। তার ভাষ্য উদ্ধার করছি :

> The long standing demand that feminists stand witness to the patriarchal ills of Islam has now been enlisted in the service of one of the most unabashed imperial projects of our time.[১]

পশ্চিমের সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় বসে উদারনীতিবাদ ও সভ্যতার দ্বন্দ্বের মশালধারীদের সমালোচনা করা মানে চরমপন্থি হিসেবে নির্ঘাত ছাপ খাওয়া। সেখানে সাবা সাহসের সাথে বলেছেন—উদারনীতিবাদের ব্যাখ্যাত স্বাধীনতা, কর্তাসত্তা ও অধিকারের অপর্যাপ্ত ধারণা দিয়ে একটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সত্তা ও ভাবজগৎকে বোঝা যাবে না। অ্যাকাডেমিয়ার জগতে সাবার সবচেয়ে বড়ো অবদান হচ্ছে উদারনীতিবাদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অধিকার ও স্বাধীনতার ধারণাকে পর্যালোচনা করা। রাজনীতি ও সমাজে পর্যালোচনামূলক রূপান্তর এমনভাবে হতে পারে, যেখানে রূপান্তরের নায়করা উদারনৈতিক অর্থে অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এই রূপান্তরগুলো নৈতিক অর্থেও হতে পারে—যা কিনা মুসলিম সমাজে হয়। সাবা মাহমুদ তার লেখালিখিজুড়ে এসব কথাই বারবার বলেছেন।

সাবা মাহমুদ পাকিস্তানের কোয়েটায় ১৯৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি জড়িয়ে পড়েন বামপন্থার রাজনীতিতে। পশ্চিমা নারীবাদের চিন্তাভাবনায় তিনিও হয়ে ওঠেন উৎসাহী সমর্থক। ইসলামের ভেতরে নারীদের কোনো এজেন্সি নেই, এখানে নারীদের অবস্থান একেবারেই অধীনতামূলক বা অধস্তনসুলভ, অপ্রধান, গৌণ—এ রকম ধারণা সাবাকেও পেয়ে বসে। ইসলামের এই নিবর্তনমূলক কাঠামো ভাঙাকেই তিনি তখনকার মতো প্রগতিশীলতার এক মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেন।

১৯৭০-এর দশকে জিয়াউল হকের ইসলামিকরণ পরিকল্পনা তার কাছে মনে হয় এটি পাকিস্তানে এতদিন যতটুকু লৈঙ্গিক সমতা ও নারীর এজেন্সি ছিল, সেটিও ধসিয়ে দিয়েছে। তিনি আমেরিকায় পাড়ি জমান। প্রথমে চেয়েছিলেন স্থপতি হতে। কিছুদিন সে বিদ্যা নিয়ে নাড়াচাড়াও করেন। পরে নৃতত্ত্বে ঝোঁকেন এবং এই বিদ্যাই পরবর্তী সময়ে তার চিন্তাকাঠামো নির্মাণ করে।

এটা ধরেই নেওয়া যায়, সাবার মতো একজন প্রগতিশীল নারীবাদী, বামপন্থি রাজনীতির সক্রিয়তাবাদী কর্মী পশ্চিমে এসে পশ্চিমের নারীবাদী ভাবনায় আরও নিমজ্জিত হয়ে পড়বেন। কিন্তু সে রকম ঘটনা তো ঘটেইনি; বরং সাবার ক্ষেত্রে ঘটেছে ব্যতিক্রম। প্রথমে উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং ৯/১১-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থা তার চিন্তার দুনিয়ায়

বড়ো রকমের ধাক্কা দেয়। বিশেষ করে কায়রোতে ধার্মিক মুসলিম নারীদের ওপর এথনোগ্রাফি করার সময় তার মনে হয় পশ্চিমা চিন্তাকাঠামোর ভেতরেই বড়ো রকমের অসংগতি ও ত্রুটি রয়েছে। এই চিন্তাটা নিজেকে নিরপেক্ষ দাবি করলেও আদতে নিরপেক্ষ নয়। এটা নিজেকে শুধু শ্রেষ্ঠ মনে করে না, শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে অন্য চিন্তাকে দাবিয়ে রাখতে চায়। পশ্চিমের বাইরেও বিভিন্ন শ্রেণির জনগোষ্ঠী আছে। আছে তাদের সংস্কৃতি, জীবনযাপন পদ্ধতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচরণ ও এজেন্সির মতো বিষয়। এটা পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্বে ধরা পড়ে না। তারা তাদের মানদণ্ড দিয়ে অন্যকে মাপতে চায়। সাবার কথা উদ্ধার করছি :

> This language of assessment, I realized, is not neutral but depends upon notions of progressive and backward, superior and inferior, higher and lower–a set of oppositions frequently connected with a compelling desire to erase the second modifier even if it means implicitly forming alliances with coercive modes of power.[২]

সাবা নতুন করে পশ্চিমকে পাঠ করেন। তার এই পুনর্পাঠ তাকে পশ্চিমা নারীবাদ ও সেকুলারিজম বিষয়ে সংশয়ী করে তোলে। অথচ যে বস্তুকে নাকি ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আন্তঃধর্মীয় সংঘাতের সমাধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সাবা নারীর অধিকার, সংখ্যালঘু প্রশ্ন ও সেকুলারিজম নিয়ে বিস্তর কথা বলেছেন। কিন্তু তার মানে তার পক্ষপাত কখনোই নারীবাদ ও সেকুলারিজমের দিকে হেলে পড়েনি। সাধারণত দেখা যায়—যারা সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি সোচ্চার হয়, তারা সেকুলারিজমের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। কিন্তু সাবা সেকুলারিজম বিষয়ের সমালোচনা করেন। সাবা অত্যন্ত নিপুণতার সাথে পশ্চিমা নারীবাদীদেরও সমালোচনা করেন, যা কিনা সামাজিক প্রথা এবং পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের পরিচয় নিশ্চিত করে। সাবার মতে এই রকম প্রতিরোধের ভেতর দিয়ে এজেন্সিকে শনাক্ত করার পশ্চিমা পদ্ধতি ধর্মীয় আন্দোলনের সাথে জড়িত নারীদের আকাঙ্ক্ষাকে ধরতে পারে না। সাবা তার মিশরে দাওয়া আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের ওপর করা এথনোগ্রাফিতে দেখানোর চেষ্টা করেন, ধর্মের শিক্ষার প্রতি ধার্মিক নারীদের আনুগত্য ও সমর্পণ এজেন্সির অনুপস্থিতি ও কর্তাসত্তা হিসেবে নারীর অক্ষমতা হিসেবে শনাক্ত করা

যায় না; বরং এই ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে থেকেও এজেন্সিকে ব্যবহার করে নারীরা তাদের অধিকার আদায় করতে পারে।

দুই

সাবা মাহমুদের শক্তিশালী কিতাব *পলিটিক্স অব পাইটি* গতানুগতিক পশ্চিমের নারীবাদবিষয়ক ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ ও চিন্তাচেতনাকে একটা বড়ো রকমের ঝাঁকুনি দিয়েছে, সন্দেহ নেই। এই কিতাবটি প্রধানত একটি সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ধারণার সাথে বোঝাপড়া করেছে। এটির বিষয়বস্তু তৈরি হয়েছে কায়রোর তিনটি মসজিদকেন্দ্রিক ধার্মিক মুসলিম নারীদের সামাজিক তৎপরতার ওপর মাঠ পর্যায়ের এথনোগ্রাফির ফলাফলকে ভিত্তি করে। এই ধার্মিক নারীদের কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য নেই কিংবা রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশগ্রহণের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। সাবা আমাদের জানিয়েছেন, তিনি তার নিজ দেশে এ ধরনের গবেষণা করেননি, যাতে এটির ফলাফল পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক থাকে। তার মাঠ পর্যায়ের জরিপের সময় (১৯৯৫-৯৭) দেখেন, এইসব মসজিদে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি থেকে ধার্মিক মহিলারা আসেন। এরা খুব উঁচুমানের কথোপকথক। এরা পরস্পরকে ধর্ম বিষয়ে সবক দেন। এর বিষয়বস্তু কেন্দ্রীভূত থাকে ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো, ইসলাম নির্ধারিত সামাজিক চর্চা ও শারীরিক কসরত—যা একটি ধার্মিক সত্তা নির্মাণে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সাবা খেয়াল করেন মসজিদকেন্দ্রিক এই সামাজিক তৎপরতা পুরো মিশরে একটি নতুন ঘটনা হিসেবে হাজির হয়। এতকালের পুরুষ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ ও ইসলামি শিক্ষার পরিসর নারীরা এসে ভরে তোলে। শুধু তা-ই নয়, ইসলামি কাঠামোর মধ্যে এইভাবে একটি বিতার্কিক সিলসিলা গড়ে ওঠে। এসব নারীরা ধর্মীয় নির্দেশের আলোকেই পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার ফয়সালা খুঁজে বের করে। সাবার কাছে মনে হয়, এটা ইসলামি কাঠামোর মধ্য থেকেই নারীর ক্ষমতায়নকে সংহত করার একটা ভিন্ন পন্থা।

এই ধার্মিক নারীরা সরাসরি রাজনৈতিকতার সাথে যুক্ত না থাকলেও এদের আচার-ব্যবহার, পোশাক-আশাক, জীবনবীক্ষা জনপরিসরে প্রসারিত হওয়ার ফলে উদারনৈতিক সেকুলারবাদীরা তাদের প্রভাব হ্রাসের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সেই অর্থে সাবা এই ধরনের সামাজিক তৎপরতাকে একধরনের রাজনৈতিকতা হিসেবে মত দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, ১৯৭০ এর দশক থেকে দুনিয়াজুড়ে যে মুসলিম চেতনার একটা ফল্গু ছড়িয়েছিল, যাকে সাবা নিজেও বলেছেন ইসলামি পুনরুজ্জীবন, বৃহত্তর

ক্যানভাসে দেখলে এটি ছিল তারই অংশ। এই নারীরা কেন এ রকম মসজিদকেন্দ্রিক তৎপরতার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল? সাবা মনে করেন, মিশরের সেকুলার প্রশাসনের নির্মমতার মুখে মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন থেকে ইসলামের এজেন্সি সংকুচিত হয়ে যাওয়ার কারণেই এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়। মিশরের এই অযাচিত আলামানিয়া—সেকুলারায়নের অভিঘাতে ইসলামি শাস্ত্রের ব্যাবহারিক কার্যকারিতা রীতিমতো বিমূর্ত হয়ে উঠেছিল। এর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মসজিদকেন্দ্রিক তৎপরতা শুরু হয়। এর মাধ্যমে মুসলিম নারীদের ইসলামি কাঠামো ও শাস্ত্রের ভেতরেই দৈনন্দিন জীবনযাপন ও বেঁচে থাকার লড়াইয়ে নৈতিক যুক্তিগুলোকে সামনে নিয়ে আসা হয়। এর মাধ্যমে শুধু ধর্মীয় কর্তব্য পালনের দিকটি দেখা হয় না, ইসলামি নৈতিকতার ভিত্তিতে দৈনন্দিন জীবনযাপনের ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সাবা একটু অবাক হন—এইসব নারী মিশরের প্রগতিশীল নারীবাদী আন্দোলনের দিকে না ঝুঁকে কেন এমন একটা তৎপরতার সাথে জড়িত হয়, যা কিনা একটা পিতৃতান্ত্রিক নিবর্তনমূলক ব্যবস্থাকেই সমুন্নত করে বলে মনে করা হয়। শুধু তা-ই নয়, এ ধরনের তৎপরতাকে মৌলবাদ, নারী নিপীড়ন, সামাজিক রক্ষণশীলতা, পেছনে ফিরে যাওয়ার প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা, সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা প্রভৃতির সাথে যুক্ত করে দেখা হয়। সাবা এই ধার্মিক নারীদের পশ্চিমা উদারনৈতিক নারীবাদের চোখে না দেখে তাদেরকে তাদের বিশ্বাসের জায়গায় রেখে বোঝার চেষ্টা করেছেন। সাবার কথোপকথকরা, যারা সবার কাছে দাইয়াত হিসেবে পরিচিত, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিম নারীদের ভেতরে একধরনের নৈতিক আচার, নৈতিক কর্তাসত্তা ও আত্মনির্মাণের ধারণাকে প্রশস্ত করেছেন। শুধু তা-ই নয়, তারা ধার্মিকতার বহিঃস্থ রূপের একটা নির্দেশক তৈরি করেছেন। যেমন : পোশাক ও জবানের নির্দিষ্ট শৈলী, শিশু ও বয়স্কদের আচরণবিধি ও বিনোদন, অর্থনৈতিক ও গৃহস্থালি ব্যবস্থাপনা, দরিদ্রদের শুশ্রূষা এবং জনপরিসরের বিতর্কগুলো মোকাবিলার মানদণ্ড।

সাবা দেখিয়েছেন, এই ধরনের তৎপরতা ধর্মীয় পরিসরে লিঙ্গ ও ক্ষমতার সম্পর্কের ভেতরে অনেক রূপান্তর এনেছে; যদিও এই রূপান্তরগুলো উদারনৈতিক ধারণাজাত স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের ভাবনাপ্রসূত না হয়ে ধর্মীয় টেক্সটকে ভিত্তি করে হয়েছে। সাবার গবেষণায় দেখা যায়, অধিকারের ধারণার বদলে নৈতিকতার ধারণা রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের বাইরে এই ধরনের রাজনৈতিক রূপান্তরের সূচনা করেছে। এই আন্দোলনগুলো দেখিয়ে দিয়েছে, এতকালকার পুরুষ নিয়ন্ত্রিত মসজিদগুলোর পরিসরে

নারীদের নজিরবিহীন আনাগোনা। যদিও এই পরিসরে আনাগোনার ইচ্ছাটা স্বাধীনতা, স্বাধিকার ও সমতার দাবির ভিত্তিতে নয়। সাবার কথোপকথকরা শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে বলেছেন, মসজিদে নারীর উপস্থিতি কুরআন ও ইসলামি আইনের ঐতিহ্য ধরে হয়েছে; উদারনৈতিক ধারণার ভিত্তিতে নয়।

আগেই বলেছি, সাবা বাম পটভূমি থেকে এসেছেন। ইসলামায়নের এই প্রক্রিয়াগুলোর সাথে স্বস্তির সম্পর্ক গড়ে তোলা তার পক্ষে কঠিনই ছিল। তার কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন, মসজিদকেন্দ্রিক তৎপরতাগুলো নিয়ে কাজ করার আগে তিনি কিছু পূর্বানুমান নিয়েই এ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দেখেন, এই ধারণা একটা মস্ত বড়ো ভুল। কারণ, এই ধার্মিক নারীদের এজেন্সি নিয়ে তাদের নিজস্ব কিছু মতামত রয়েছে। সাবা এই ধার্মিক নারীদের তৎপরতাকে মৌলবাদ কিংবা বড়ো ঘটনার তাৎপর্যহীন ভগ্নাংশ (Cogs in the Wheel) হিসেবে চরিত্রায়ণ লঘুকরণের পথ বেছে নেননি। বরং উদারনৈতিক অধিকারের ধারণার বাইরে নৈতিক জীবনের একটা যুক্তিশীল ধারণা থাকতে পারে—এ মতামতকে গ্রহণ করেছেন। সাবার সমালোচনাকারীরা তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছে—কেন তিনি তার কথোপকথকদের মৌলবাদী হিসেবে সমালোচনা করেননি। তিনি তার কিতাবে সমালোচনাকারীদের এমন এক শক্ত জওয়াব দিয়েছেন, তাতে বোঝা যায়—নৈতিকতা ও নারীবাদের ভিতরকার জটিল সম্পর্কের রসায়নটি :

> What do we mean when we as feminists say that gender equality is the central principle of our analysis and politics? How does my enmeshment within the thick texture of my informants' lives affect my openness to this question? Are we willing to countenance the sometimes violent task of remaking sensibilities, life worlds and attachments so that women of the kind I worked with may be taught to value the principle of 'freedom'? Furthermore, does a commitment to the ideal of equality in our own lives endow us with the capacity to know that this ideal captures what is or should be fulfilling for everyone else? If it does not, as is surely the case, then I think we need to rethink, with far more humility than we are accustomed to, what feminist politics really means.[৩]